Article in Bengali

Anjan Das Mazumdar

বাংলা চলচ্চিত্র সঙ্গীতের স্বর্ণযুগের গান

আধুনিক গান – সে হিন্দি হোক আর বাংলাই হোক – তার বিস্তার, জনপ্রিয়তা এবং গণতান্ত্রিকতা আসে গ্রামোফোন আবিস্কারের পরে। সিনেমায় গানের প্রচলন এসে সেই জয়যাত্রাকে আরও মসৃণ করে তোলে। আগে গান শুনতে পাওয়া যেত থিয়েটারে, বাইজিবাড়িতে বা গানের আসরে। গ্রামোফোন রেকর্ড ১৯০২ সালে আবিষ্কৃত হবার পর তা চলে এল বাড়ির অন্তঃপুরে। সাধারণ মানুষকে আকর্ষণ করার জন্য মার্গ সঙ্গীত থেকে কাওয়ালি, গজল, লঘু সঙ্গীত, লোক সঙ্গীত সবই চলে এল রেকর্ডের ব্যাপক প্রসার ও প্রচার ব্যবস্থার কল্যাণে। বিশ্ব চলচ্চিত্রে শব্দ আসে ১৯২৭ সালে "দি জাজ সিঙ্গার" ছবিতে। ভারতের প্রথম সবাক ছবি "আলম আরা" ১৯২৭ সালে মুক্তি পায়। প্রথম বাংলা সবাক ছবি জামাই ষষ্ঠী মুক্তি পায় সেই বছরেই ১৯২৭ সালের ২৫ এপ্রিল। সে ছবির সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন ক্ষীরোদ গোপাল মুখোপাধ্যায় , কিন্ত ছবিতে গান ছিল না। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ছবি "জোরবরাত" এবং "ঋষির প্রেম" -দুটিরই পরিচালক জ্যোতিষ মুখোপাধ্যায়। জোরবরাতে গান ছিল না কিন্ত ঋষির প্রেম ছবিতে গান এল। সঙ্গীত পরিচালক হীরেন বসু ও ধীরেন বসু দুজনেই অভিনয়ও করেছিলেন। ছবির দুই নায়িকা কাননবালা আর সরযুবালাও গান জানেন বলেই ছবিতে স্থান পেলেন। বাংলা ছবিতে সেই প্রথম গান। ১৯৩১ সালের ৩রা অক্টোবর ক্রাউন সিনেমায় মুক্তি পেল "ঋষির প্রেম"।

নীতিন বসুর পরিচালনায় "ভাগ্য চক্র" ছবিতে প্রথম গান আসে বলে একটা কথা প্রচলিত। আসলে প্রথম প্লে ব্যাক। ভাগ্যচক্র ছবির আগে সব ছবিতেই অভিনেতা অভিনেত্রীরা সরাসরি ক্যামেরার সামনে সংলাপ বলার মত গান গাইতেন আর বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে বিভিন্ন যন্ত্রীরা পর্দার আড়ালে বসে বাজনা বাজাতেন। পরের দিকে অবশ্য হলের সংখ্যা বেড়ে গেলে তা হত না- যেভাবে গান রেকর্ড করা হত সেই ভাবেই বাজনা রেকর্ড করা হত। মানে অভিনয় করতে করতে অভিনেতা গান গাইছেন আর ক্যামেরার আড়ালে বসে যন্ত্রীরা বাজাচ্ছেন। তাঁর মানে কিন্ত সব অভিনেতা অভিনেত্রী রাই গায়ক বা গায়িকা ছিলেন না। মূলত প্রধান চরিত্রে যারা আছেন বা

যাদের গলায় গান থাকবে তাঁদের গান জানতে হত। সেই জন্য সেই সেই সঙ্গীতশিল্পী দের কথা ভেবে তাঁদের গান ও অভিনয় দৃশ্য রাখা হত। যেমন মালকাজান, হরিমতী, রাধারাণী, ইন্দুবালা, কমলা ঝরিয়া, কৃষ্ণ চন্দ্র দে এমনকি তুলসী চক্রবর্তীও গান গেয়েছেন পার্শ্বচরিত্রের সুবাদে – কখনও বিবেক, কখনও ভিখারী, কখনও বাঈজী, কখনও অন্য ভূমিকায়।

ভাগ্যচক্র ছবিতে প্লে ব্যাক শুরু হওয়া নিয়ে একটা সুন্দর কাহিনি আছে। পঙ্কজ মল্লিকের 'আমার যুগ আমার গান' বইতে আছে যে একদিন পঙ্কজ বাবু পাশের বাড়িতে রেকর্ডে চলা একটা ইংরেজি গানের রেকর্ডের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইছিলেন দেখে ভাগ্যচক্র ছবির পরিচালক নীতিন বসু স্টুডিওতে ঐ একই রেকর্ড চালিয়ে পঙ্কজ বাবুকে গানটির সঙ্গে গাইতে বলেন। নীতিন বাবু দেখেন যে মনে হচ্ছে পঙ্কজ বাবুই যেন গাইছেন। ব্যস মাথায় ঢুকে গেল ব্যাপারটা। এর পর থেকে গান আগে থেকে রেকর্ড করে সেটা চালিয়ে অভিনেতা অভিনেত্রী গানের অভিনয় করা আরম্ভ করলেন । এভাবেই 'প্লে অ্যালং' থেকে 'প্লেব্যাক' এল বাংলা তথা ভারতীয় ছবিতে । ইংরাজি গানটা ছিল PAGAN ছবিতে PAGAN LOVE SONG । RAMAN NORARE গানটা গেয়েছিলেন ।
ভাগ্যচক্র ছবিতে প্রথম প্লে ব্যাক পদ্ধতি প্রয়োগ করে যে গানটি রেকর্ড হয় সেটা হচ্ছে বাণীকুমার রচিত 'মোরা পুলক যাচি, তবু সুখ না মানি/ যদি ব্যথায় দোলে তব হৃদয়খানি। সখীদের সমবেত সঙ্গীতে কন্ঠ দিয়েছিলেন উমাশশী দেবী, পারুল বিশ্বাস আর সুপ্রভা ঘোষ যিনি বিবাহের পর সরকার হন। এই পারুল বিশ্বাস হচ্ছেন সঙ্গীতকার অনিল বিশ্বাসের নিজের বোন আর সুরকার ও বাঁশিবাদক পণ্ডিত পান্নালাল ঘোষের স্ত্রী। আদি যুগের বহু বাংলা এবং হিন্দি ছবিতে পারুল বিশ্বাস গান গেয়েছেন।

একটা কথা বলা দরকার যে এই ১৯৩১ থেকে ১৯৩৫ পর্যন্ত সব ছবিতে গান থাকতো এমন নয়। কিছু উল্লেখ যোগ্য ছবির নাম করি যাতে গান ছিল। যেমন রাইচাদ বড়ালের সুরে দেবকী বসুর পরিচালনায় ১৯৩২ সালের ছবি "চন্ডীদাস" আর ১৯৩৩ সালের ছবি "মীরাবাঈ", রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিচালিত ১৯৩২ এর ছবি "নটীর পূজা", জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় সুবল দাসগুপ্তর সুরে ১৯৩৩ সালের ছবি "জয়দেব" আর কাজী নজরুল ইসলামের সুর আর পরিচালনায় ১৯৩৪ সালের ছবি "ধ্রুব" ইত্যাদি ইত্যাদি। গান ছাড়া আবহ সঙ্গীতের জন্যও অবশ্য সঙ্গীতকার দরকার হত। সে সময়ের অধিকাংশ ছবির গানই আর শোনা যাবে না, কারণ সে ছবির কোন প্রিন্ট নেই। আর তখন তো ছবির গানের গ্রামোফোন রেকর্ড করার চল ছিলনা। কিছু কিছু ছবির গান এখনও পাওয়া যায় যেমন চন্ডীদাস। মজার ব্যাপার হল এই চন্ডীদাস ছবির সবচেয়ে জনপ্রিয় গানটি ছিল পঙ্কজ মল্লিকের সুরে 'স্বয়ংবরা' নাটক থেকে নেওয়া। পরিচালক দেবকী বসু পঙ্কজ বাবুকে বলে গানটি "চন্ডীদাস" ছবিতে কৃষ্ণ চন্দ্র দে কে দিয়ে গাওয়ান। ছবির সুরকার কিন্ত ছিলেন রাইচাদ বড়াল। গানটি ছিল ঃ

১) ১৯৩২ - ফিরে চল ফিরে চল – শিল্পী কৃষ্ণচন্দ্র দে – সুর পঙ্কজ মল্লিক/রাইচাদ বড়াল - চলচ্চিত্র - "চন্ডীদাস" (পরিচালক- দেবকী বসু)

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা দরকার যে নাটকের গান যেমন ছবিতে নেওয়ার চল ছিল , ঠিক তেমনই মঞ্চ সফল নাটক নিয়ে ছবি করার প্রথাও চলেছিল বেশ কিছুদিন বিশেষ করে বেশ কিছু ছবি বাণিজ্য সফল হওয়ায়। এভাবেই ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদের নাটক 'আলিবাবা' চলচ্চিত্রায়িত করলেন মধু বসু। মরজিনার ভূমিকায় তাঁর স্ত্রী শিক্ষিতা সুন্দরী নাট্য পটিয়সী অভিজাত ঘরের সাধনা বসু। সে ছবি একেবারে মারমার কাটকাট হল।

প্রথম দিকের চলচ্চিত্রকারদের কথা বলতে গিয়ে এসে গেলেন তিন 'বসু' পরিচালক। দেবকী, নীতিন আর মধু। এঁদের কথা বলে নেওয়া যাক পরের পর্বে আসার আগে। নীতিন বসুর জন্ম ১৮৯৭ সালে। কুন্তলীন তেলের আবিষ্কর্তা হেমেন্দ্র মোহন বসু আর মৃণালিনীর সন্তান। মৃণালিনী আবার সত্যজিৎ রায়ের দাদু উপেন্দ্রকিশরের আপন বোন। নীতিন বসুর ভাই বোনরাও সব নাম করা। রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী মালতী ঘোষাল তাঁর বোন, ভারতের

প্রথম সফল শব্দযন্ত্রী মুকুল বসু আর ক্রিকেটার কার্ত্তিক বসু তাঁর ভাই। নিউ থিয়েটারস স্টুডিও তে কাজ শুরু করে চলে যান বোম্বে। একটা সময়ে তিনি হিন্দি চলচ্চিত্র জগতকে শাসন করেছেন। দীদার, গঙ্গা যমুনা তাঁর পরিচালনায় নির্মিত। ১৯৭৭ সালে দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। ভাগ্যচক্রের হিন্দি রূপান্তর "ধুপছাও" ছবিতে একটা বিখ্যাত গান ছিল 'বাবা মন কি আঁখে খোল' – গেয়েছিলেন কৃষ্ণ চন্দ্র দে। নীতিন বসুর পরিচালনায় 'জীবন মরণ' ছবিতে পঙ্কজ মল্লিকের সুরে কিম্বদন্তী গায়ক কুন্দনলাল সায়গলের দুটি গানের যে কোন একটি থাকবে আমাদের চয়নে। ১৯৩৯ সালের -

২) ১৯৩৯ - পাখি আজ কোন কথা কয়/ শুনি ডাকে আমায় – কন্ঠ -সায়গল- সুর পঙ্কজ মল্লিক - "জীবন মরণ" (পরিচালক – নীতিন বসু)

ফিরে আসি পরিচালকদের কথায়। দেবকী বসু জন্ম গ্রহণ করেন নীতিন বসুর ১ বছর পরে ১৮৯৮ সালে বর্ধমানের 'অকালপোষ' গ্রামে। বাবা ছিলেন নামী উকিল। বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে স্নাতক হয়ে এম এ পড়ছিলেন। মহাত্মা গান্ধির ডাকে পড়া ছেড়ে দিলেন। পত্রিকা সম্পাদনা করতেন, তাঁর পর চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে যুক্ত হন। বাংলা, হিন্দী, এমনকি মারাঠী, তামিল ছবিও করেছেন। ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে তাঁর ১৯৩৪ সালের ছবি 'সীতা' সম্মাননা ডিপ্লোমা পুরস্কার পায় । তিনিই সারা ভারতে প্রথম আন্তর্জাতিক উৎসবের পুরস্কার প্রাপক। ১৯৫৯ সালে নির্মিত তাঁর 'সাগর সঙ্গমে' ছবিটি নবম বার্লিন উৎসবে 'গোল্ডেন বিয়ার" বিভাগে মনোনীত হয়। দেবকী বসু ছিলেন সাত্ত্বিক বৈষ্ণব। ভারতের চলচ্চিত্র ইতিহাসে তিনি এক স্বর্ণসন্তান।

আসা যাক আর এক বসু - মধু বসুর কথায়। বাবা প্রমথ নাথ বসু ছিলেন বিখ্যাত জিওলজিস্ট। জামসেদপুরে লোহার আকরিকের সন্ধান তিনিই দিয়েছিলেন জামসেদজী টাটা কে। ভারতের প্রথম সাবান কারখানা তাঁর। এমন উদ্যোগপতি বিজ্ঞানী খুব কমই আছেন। মধু বসুর মা ছিলেন ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র দত্তর কন্যা কমলা দত্ত বসু –যার নামে কমলা গার্লস স্কুল। ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম পুরোধা কেশব চন্দ্র সেনের দৌহিত্রী সাধনা কে বিবাহ করেন মধু বসু। তিরিশ চল্লিশের দশকে সবচেয়ে উজ্জ্বল নারী ব্যক্তিত্ব সাধনা উদয়শঙ্করের পাশাপাশি সমকালীন বিষয় নিয়ে অসাধারণ সব ব্যালে উপহার দিয়েছেন। সাধনার ছোট বোন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী নয়না দেবী- আসল নাম নীলিমা সেন। কুচবিহারের মহারাণী সুনীতি দেবী আর ময়ুরভঞ্জের রাণী সুচারু দেবী তাঁর আত্মীয়। মধু বসু সাধনা বসুর অভিনয়ে আলিবাবা, কুমকুম, রাজনর্তকী সব হিট ছবি। পরে মধু বসু মাইকেল মধুসূদন, মহাকবি গিরিশচন্দ্র আর বীরেশ্বর বিবেকানন্দ নামে তিনটি সুনির্মিত বায়োপিক করেন।

তিন 'বসু' পরিচালকের পর আসা যাক কানন দেবীর কথায়। বাংলা চলচ্চিত্রের প্রথম তারকা কানন দেবীর জন্ম হাওড়ায়। তাঁর আত্ম জীবনী 'সবারে আমি নমি'-তে আছে তিনি বাবা আর মা হিসাবে জানতেন রতন চন্দ্র দাস আর রাজবালাকে। অর্থ উপার্জনের জন্য কম বয়সেই তাঁকে অভিনয়ে যোগ দিতে হয়। সেই নিম্নবিত্ত অবস্থা থেকে সংগ্রাম আর একটু একটু করে উঠে আসা। তাঁর আত্ম প্রতিষ্ঠার ক্রম বিবর্তনের মাধ্যমে জীবনের সায়াহ্নে এসে যে সন্মানের আসনে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা এক কথায় অনবদ্য। অথচ প্রায় একই সময়ে উচ্চবিত্ত পরিবারের উচ্চ শিক্ষিতা, সুন্দরী, নৃত্য পটিয়সী সাধনা বসু নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করতে না পারার জন্য হারিয়ে গিয়েছিলেন জনমানস থেকে। কাননবালা থেকে কানন দেবীতে উত্তরণ এক রূপকথার মত। মহিলা শিল্পী মহল প্রতিষ্ঠা সহ অসংখ্য জনহিতকর কাজে তিনি নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৭৬ সালে তিনি দাদা সাহেব ফালকে পুরস্কারও পেয়েছেন।

কানন দেবী বহু ছবিতেই জনপ্রিয় গান গেয়েছেন। তাঁর মধ্য থেকে দুটি গান বেছে নেওয়া যাক। প্রথমটি ১৯৩৯ সালের দেবকী বসু পরিচালিত 'সাপুড়ে' ছবির একটি নজরুলগীতি। আসলে কাজী নজরুল ইসলাম সারা তিরিশের দশক ধরে ওতপ্রোত ভাবে চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, কাজেই তাঁর সুরের একটি গান এই

চয়নে অনিবার্য কারণেই স্থান পাবে। আর দ্বিতীয় গানটি সেই বছরেই মুক্তি পাওয়া শেষ উত্তর ছবির – যার পরিচালক আসামের গৌরীপুরের রাজপরিবারের সন্তান প্রমথেশ বড়ুয়া। সুদর্শন প্রমথেশ প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে পাস করে ইউরোপ গিয়ে চলচ্চিত্রের প্রতি আকৃষ্ট হন। প্রথম অভিনয় ১৯৩১ সালে 'অপরাধী' ছবিতে। তারপর কাহিনি রচনা, চিত্রনাট্য, সম্পাদনা, পরিচালনা সব কাজে দক্ষ হয়ে ওঠেন। নাটকের অভিনয় ধারায় অভিনয় করার ট্র্যাডিসন ভেঙ্গে সাবলীল সহজ অভিনয় করা, কৃত্রিম আলোর ব্যবহার এমন সব অসংখ্য বিষয়ে অবদান তাঁর। তাঁর দেবদাস আজও চলচ্চিত্রমোদিদের আলোচনার বিষয়। নজরুল, প্রমথেশ এবং কানন দেবীর কথা না বললে বাংলা ছবি সম্পর্কে যে কোন প্রতিবেদনই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আগেই বলা হয়েছে কাজী নজরুল ইসলাম ১৯৩৪ সালে ধ্রুব নামে একটি ছবি পরিচালনাও করেছিলেন। সেই ছবিতে তিনি নারদের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন।

এই চয়নে থাকছে সাপুড়ে ছবির 'আকাশে হেলান দিয়ে' আর 'শেষ উত্তর' ছবিতে 'আমি বনফুল গো' গান । সে যুগের হিট প্রমথেশ বড়ুয়া পরিচালিত "শেষ উত্তর" চলচ্চিত্রে কানন দেবীর আরও দুটি বিখ্যাত গান ছিল 'তুফান মেল' এবং 'যদি আপনার মনের মাধুরী মিশায়ে'।

৩) ১৯৩৯ - আকাশে হেলান দিয়ে – কন্ঠ কানন দেবী- সুরকার কাজী নজরুল ইসলাম- " সাপুড়ে" (পরিচালনা- দেবকী বসু)

৪) ১৯৪২ - আমি বনফুল গো – কানন দেবী- সুরকার কমল দাস গুপ্ত - "শেষ উত্তর" (পরি-প্রমথেশ বড়ুয়া)

এবার আরেকজনের কথা বলে নেওয়া যাক। প্লে ব্যাক প্রথা চালু হওয়া সত্ত্বেও গান জানেন এমন অভিনেতা অভিনেত্রীদের কদর চল্লিশের দশক পর্যন্ত যথেষ্টই ছিল। কৃষ্ণ চন্দ্র দে, কানন দেবী, কে এল সায়গল সেই পরম্পরার মানুষ। এমনই আরেকজন গায়ক অভিনেতা সম্ভবত সেই পরম্পরার শেষ নায়ক রবীন মজুমদারের একটা গান থাকবে এই চয়নে। কলেজ সোশ্যাল অনুষ্ঠানে তাঁর গান শুনে প্রমথেশ বড়ুয়া তাঁর ১৯৪০ সালের শাপমুক্তি ছবিতে তাঁকে অভিনয়ের সুযোগ দেন। চল্লিশের দশকের অন্যতম সেরা গায়ক নায়ক অভিনেতা তিনি। দেবকী বসুর 'কবি' ছবি যেন তাঁর কথা ভেবেই তৈরি। শেষ জীবন অবশ্য তাঁর দুঃখের। মরফিনের নেশা থেকে তাঁকে মুক্ত করেন সুরকার ডাক্তার নচিকেতা ঘোষ। রবীন মজুমদারের বোন হচ্ছেন বাচিক শিল্পী গৌরী ঘোষ। নীরেন লাহিড়ির পরিচালনায় কমল দাস গুপ্তর সুরে ১৯৪২ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'গরমিল' ছবির সেই বিখ্যাত গান 'এই কি গো শেষ দান' টিকে রাখা হয়েছে এই নির্বাচনে। বলা বাহুল্য ছবির নায়ক রবীন মজুমদারই।

৫) ১৯৪২ - এই কি গো শেষ দান – রবীন মজুমদার- সুরকার কমল দাস গুপ্ত- "গরমিল" (পরিচালনা – নীরেন লাহিড়ী)

বাংলা সবাক চলচ্চিত্রের প্রথম পর্বে তিন সুরকারের অবদান অসীম। রাইচাদ বড়াল, পঙ্কজ মল্লিক আর কমল দাসগুপ্ত। কমল বাবুর স্ত্রী হচ্ছেন নজরুল গানে বিখ্যাত ফিরোজা বেগম। কমল দাস গুপ্তের ভাই সুবল দাসগুপ্ত ও ছিলেন এক প্রথিতযশা সুরকার। পঙ্কজ মল্লিকের বিশেষত্ব তিনি সুরকার হিসাবে যেমন দক্ষ, তেমনই গায়ক হিসাবেও অত্যন্ত জনপ্রিয়। আজও ইউ টিউব খুললে দেখা যাবে তাঁর মুগ্ধ শ্রোতাদের মন্তব্য। রাইচাদ বড়ালের বাবা লালচাঁদ বড়াল ছিলেন নামকরা ধ্রুপদ বিশেষজ্ঞ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী। সুরকারদের মধ্যে প্রথম পঙ্কজ মল্লিক ১৯৭২ সালে, আর রায়চাদ বড়াল ১৯৭৮ সালে দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার পান। সঙ্গীতের জগতের এই দুই সুরকারই প্রথম দাদাসাহেব ফালকে প্রাপক। এঁদের পর ১৯৮১ সালে ফালকে পুরস্কার পান নৌশাদ।

এই যে আমরা সাল ধরে ধরে সুরকার আর পরিচালক ধরে ধরে বাংলা সিনেমার গানের একটা পরিচয় রাখছি সেখানে পরিচালক বিমল রায় এবং তাঁর পরিচালনায় 'উদয়ের পথে' কে স্থান দিতেই হবে। উদয়ের পথের এই

গানটির গায়িকা রেখা মল্লিক। ঠিক গানের জন্য নয়, যুগান্তকারী চলচ্চিত্র "উদয়ের পথে"-র কথা ভেবেই এই ছবিকে নির্বাচন। ছবির সুরকার সেই রাইচাদ বড়াল। সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন নিয়ে আত্মবিশ্বাসী এক শিক্ষিত যুবকের মুখে চোখা চোখা সংলাপ সে যুগে লোকের মুখে মুখে ঘুরত। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে পাস করা রাধামোহন ভট্টাচার্য ছিলেন এই ছবির প্রোটাগনিস্ট। রাধামোহন ছিলেন সেই সময়ের শিক্ষিত তরুণ দের আইডল।

৬) ১৯৪৪ - গেয়ে যাই গেয়ে যাই – রেখা মল্লিক- সুরকার রায়চাদ বড়াল- "উদয়ের পথে" (বিমল রায়)

এই গানটার পর আরেক গায়ক অভিনেতা কুন্দন লাল সায়গলের কথা একটু বলে নেওয়া যাক। জম্মুতে জন্ম তাঁর এক পাঞ্জাবী পরিবারে। রাইচাদ বড়ালের মাধ্যমে গায়ক হিসাবে আত্মপ্রকাশ তাঁর। সায়গলের অভিনয়ের হাতেখড়ি নিউ থিয়েটারস স্টুডিওতে। সেখান থেকে শুরু করে বোম্বাই গিয়ে সফল অভিনেতা হিসাবে তাঁর প্রতিষ্ঠা চমক লাগার মত। কোন প্রথাগত সঙ্গীত শিক্ষা ছাড়াই শুধুমাত্র ব্যারিটোন কন্ঠ আর মাদকতাময় নরম স্বরক্ষেপনে তিনি যাদু সৃষ্টি করতেন। রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ড করেন – যা আজও জনপ্রিয়। কলকাতায় তাঁর দীর্ঘ বাস নিয়ে ঔপন্যাসিক ডাক্তার ইন্দ্রনীল সান্যালের লেখা 'কুন্দন' উপন্যাসটি কেউ পড়ে দেখলে এই অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় পাবেন। তাঁর গানের কথা অবশ্য "জীবন মরণ" ছবি প্রসঙ্গে আগেই এসেছে।

এই নিবন্ধে আলোচিত প্রথম গান 'চণ্ডীদাস' চলচ্চিত্র থেকে উদয়ের পথে পর্যন্ত বার বছরের মধ্যে ছটি গানকে নির্বাচন করা হয়েছে। ১৯৪৪ সালের পরেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি, দেশ স্বাধীন হওয়া এমন যুগান্তকারী সব ঘটনা ঘটছে। চিন্তায়, ভাবনায়, গানে, সুরে, লেখায় এক প্রচ্ছন্ন পরিবর্তনের ইঙ্গিত। আই পি টি এর সৌজন্যে গণ সঙ্গীত এবং এক ঝাঁক নতুন শিল্পী এলেন গানে, নাটকে, চলচ্চিত্রে, তাঁদের সজীব সৃষ্টিশীলতা কে সম্বল করে। হেমাঙ্গ বিশ্বাস, সলিল চৌধুরী, দেবব্রত বিশ্বাস, সুচিত্রা মিত্র, শম্ভু মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, ঋত্বিক ঘটক, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এভাবেই আত্ম প্রকাশ করলেন পঞ্চাশের দশকে।

গানের আলোচনায় আমরা চলে আসব পঞ্চাশের দশকে এখন। একদম গোড়ার দিকের ছবি পাশের বাড়ি, সুধীর মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনা, ১৯৫২ সালে মুক্তি পায়। আধুনিক কাহিনী। এই ছবির কাহিনি নিয়ে অনেক পরে ১৯৬৮ সালে 'পড়োশান' নামে এক হিন্দি ছবি হয়। তাতে এক বিখ্যাত গান ছিল 'মেরে সামনে ওয়ালি খিড়কি'। সুর ছিল রাহুল দেব বর্মণের। প্রায় একই ধরণের এক দৃশ্য ছিল বাংলা ছবিটিতেও। বাংলা ছবির সুরকার ছিলেন সলিল চৌধুরী। নায়িকা সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রেমালাপ করতে চাইছেন নায়ক সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর হয়ে গান গাইলেন বন্ধু ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য পর্দায় এবং কন্ঠেও । ধনঞ্জয় বাবু গাইলেন বিমল চন্দ্র ঘোষের লেখা একটি অবিস্মরণীয় গান 'ঝির ঝির ঝির বরষায়'।এ গানের সুরের চলন তখনকার প্রচলিত সুরের থেকে একদম আলাদা। নতুন প্রজন্মের গান, সুর, অভিনয়ের হাতছানি দিল এই গান। শততম বর্ষে উপনীত কালজয়ী শিল্পী ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য কে শ্রদ্ধা এই গান দিয়ে। আহা কি সুর আর কি গায়কী এই গানটির।

৭) ১৯৫২-ঝির ঝির ঝির ঝিরি বরষায় – ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য -সুর- সলিল চৌধুরী- "পাশের বাড়ি" (পরিচালক – সুধীর মুখোপাধ্যায়)

পঞ্চাশের দশক বাংলা চলচ্চিত্র এবং বেসিক গানের স্বর্ণযুগ। সেই যুগের কথায় এখন আসব আমরা। ১৯৫৪ সালে অগ্রদূত গোষ্ঠী আশাপূর্ণা দেবীর কাহিনি অবলম্বনে নির্মাণ করলেন 'অগ্নিপরীক্ষা"।এক বছর আগে নির্মল দের পরিচালনায় 'সাড়ে চুয়াত্তর' চলচ্চিত্রের মুখ্য পার্শ্ব চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন দুজন নবাগত শিল্পী। উত্তম কুমার এবং সুচিত্রা সেন। তাঁদের কেন্দ্র করেই শুরু হবে নতুন যুগ। অগ্নিপরীক্ষা ছবিতে প্রতিষ্ঠিত হল উত্তম সুচিত্রা জুটি। ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৫৪ উত্তরা পুরবী উজ্জ্বলায় মুক্তি পেল। অগ্রদূতের সুদক্ষ পরিচালনা আর অনুপম

ঘটকের অসাধারণ সুরসৃষ্টিতে বিপুল বাণিজ্য সফলতা পেল এছবি। একই বছরে নরেশ মিত্রর পরিচালনায় 'অন্নপূর্ণার মন্দির', অজয় করের 'গৃহ প্রবেশ, আর সুকুমার দাসগুপ্তর 'ওরা থাকে ওধারে' এবং 'সদানন্দের মেলা' মুক্তি পেল এই জুটিতে। অর্থাৎ অনেকেই উপলব্ধি করছেন এই জুটির সাফল্যের সম্ভাবনা। অগ্নি পরীক্ষার সবচেয়ে জনপ্রিয় বিখ্যাত গান 'গানে মোর কোন ইন্দ্রধনু'। এ ছাড়াও আছে 'কে তুমি আমারে ডাকো' গানটি। আমরা সেই গানটিই নির্বাচন করব কারণ প্রেমের গান এভাবে আর আগে আসেনি বাংলা চলচ্চিত্রে। স্বর্ণকন্ঠী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া বাংলা চলচ্চিত্র ইতিহাসের স্বর্ণযুগের অন্যতম সেরা রোম্যান্টিক গান 'কে তুমি আমারে ডাকো'। ১৯৫৪ সালের এই একটা গানই থাকছে এই চয়নে, কিন্ত রাজেন সরকার পরিচালিত 'ঢুলী' ছবির কথা বলতেই হবে। এ টি কানন, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, যূথিকা রায়, প্রসুন বন্দ্যোপাধ্যায় আর হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কিছু সুন্দর গান সমৃদ্ধ এই ছবিটি বাংলা সিনেমার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মিউজিকাল ছবি।

৮) ১৯৫৪- কে তুমি আমারে ডাকো – কন্ঠ- সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় -সুর- অনুপম ঘটক- "অগ্নি পরীক্ষা" (পরিচালনা - অগ্রদূত)

১৯৫৫ সালে মুক্তি পায় রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সুরে 'সবার উপরে' , হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরে শাপমোচন, আর পঙ্কজ মল্লিকের সুরে 'রাইকমল'। তিনটি ছবির গানই সুপার হিট। এ বছরেই আবার মুক্তি পেল সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাচালী' আর মৃণাল সেনের প্রথম ছবি 'রাত ভোর' আর তপন সিংহের দ্বিতীয় ছবি উত্তম, মঞ্জু দে, সাবিত্রী, নির্মল কুমার অভিনীত 'উপহার'। সুবোধ মিত্র পরিচালিত 'রাইকমল ছবিতে আত্ম প্রকাশ করেছিলেন কাবেরী বসু। ছিলেন উত্তম, সাবিত্রী এবং অন্যান্যরা। ছবিটি রাষ্ট্রপতির সার্টিফিকেট অফ মেরিট পদক পায়। অসাধারণ কিছু গান ছিল গীতশ্রী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পঙ্কজ মল্লিকের। ১৯৫৫ সালের নির্বাচিত গান কিন্ত শাপমোচন ছবির। সুর, কথা, অভিনয় ধারা এবং গায়কীর যে পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে এখন থেকে তারই জয়যাত্রা। যে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় জীবন শুরু করেছিলেন পঙ্কজ মল্লিকের গায়ন রীতি অনুসরণ করে, সেই তিনিই কি অবলীলায় তাঁর উচ্চারণ ও স্টাইল বদলে ফেললেন। আর সুর। এমন সহজ, সাধারণ অথচ ভাললাগার সুর এর আগে আসেনি সেভাবে। অথচ তিনি কারোর কাছেই নাড়া বেঁধে গান শেখেন নি। সেই তিনিই অনবদ্য ব্যারিটোন কন্ঠে গান গাইতে থাকলেন আর সুরও দিতে থাকলেন। সাফল্য এল হইহই করে- কি হিন্দি আর কি বাংলায়। ১৯৫৪ সালে 'নাগিন' ছবিতে সুর করে তাঁর দেশ জোড়া খ্যাতি। থাকেন বোম্বাইতে। পরিচালক সুধীর মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে কলকাতায় এসে এক দিনের মধ্যে সুর দিলেন 'শাপমোচন' ছবির। একটা নয়, দুটো নয়, অনেকগুলি গান এবং সব কটিই চূড়ান্ত জনপ্রিয়ও হল। 'শোনো বন্ধু শোনো', 'বসে আছি পথ চেয়ে', 'ঝড় উঠেছে বাউল বাতাস', 'ত্রিবেনী তীর্থ পথে", 'সুরের আকাশে তুমি যে গো' । কি সব গান। আমরা নির্বাচন করেছি শেষ গানটি।

৯) ১৯৫৫ - সুরের আকাশে তুমি যে গো – কন্ঠ ও সুর -হেমন্ত মুখোপাধ্যায় - "শাপ মোচন" (পরিচালনা -সুধীর মুখোপাধ্যায়)

একটা কথা জেনে রাখা দরকার, উত্তমের হয়ে হেমন্তর প্রথম প্লেব্যাক চার বছর আগে 'সহযাত্রী' ছবিতে রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সুরে । শৈলেন রায়ের লেখা দুটি গানের একটি ছিল 'ভালবাসার পরশমণি'। একেবারেই জনপ্রিয় হয়নি। উত্তম অভিনীত ছবিতে প্রথম সুর দেওয়া এবং তাঁর কন্ঠের সঙ্গে টোনাল সিমেট্রি বজায় রেখে যুগল রসায়ন নির্মাণ শুরু এই শাপমোচন ছবি থেকেই। সঙ্গীত পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের এগারো নম্বর বাংলা ছবি শাপমোচন তাঁকে বাংলা চলচ্চিত্রের অন্যতম সেরা সঙ্গীতকার হিসাবে প্রতিষ্ঠা দিল।

১৯৫৬ সালে সত্যজিতের 'অপরাজিত', অসিত সেনের 'চলাচল', দেবকী বসুর 'চিরকুমার সভা' এবং 'নবজন্ম', কার্ত্তিক চট্টোপাধ্যায়ের 'সাহেব বিবি গোলাম' , অজয় করের 'শ্যামলী' আর শম্ভু মিত্র অমিত

মৈত্রর পরিচালনায় 'এক দিন রাত্রে' ছাড়াও মুক্তি পেল অগ্রগামী পরিচালিত শিল্পী ও সাগরিকা। দুটিরই নায়ক নায়িকা উত্তম সুচিত্রা, সুরকার রবীন চট্টোপাধ্যায়। এত ছবির আর গানের ভিড়ে আমদের নির্বাচিত দুটি গান 'এক দিন রাত্রে' আর 'সাগরিকা' ছবি থেকে। রাজ কাপুর মাত্র একটি বাংলা ছবিতেই অভিনয় করেন এক দিন রাত্রে ছবিতে। তা ছাড়া মান্না দের কণ্ঠে ছবি বিশ্বাসের অভিনয়ে 'এই দুনিয়ায় ভাই সবই হয়' গানটা একটা মাইলস্টোন – দুরন্ত এক স্মার্ট গান। আর সাগরিকা এই কারণে যে উত্তমের কন্ঠে শ্যামল মিত্র যে কতটা মানানসই তাঁর প্রথম উদাহরণ এই ছবি।

১০) ১৯৫৬ – এই দুনিয়ায় ভাই সবই হয় – মান্না দে -সুর- সলিল চৌধুরী - "এক দিন রাত্রে" (পরিচালক - শম্ভু মিত্র/ অমিত মিত্রও)

১১) ১৯৫৬- আমার স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা – শ্যামল মিত্র -সুর-রবীন চট্টোপাধ্যায়- "সাগরিকা" (পরিচালক – অগ্রগামী)

পঞ্চাশের দশকে অগ্রদূত, অগ্রগামী, যাত্রিক – এমন সব সম্মিলিত পরিচালক গোষ্ঠী পরিচালনার কাজে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। উত্তম সুচিত্রা জুটির সাফল্যের পেছনে অনেক অবদান এঁদের স্নিগ্ধ সঙ্গীত সমৃদ্ধ চলচ্চিত্র নির্মাণের কুশলতা। এই অগ্রদূত হোল চিত্রগ্রাহক বিভূতি লাহার নেতৃত্বে চিত্রনাট্যকার নিতাই ভট্টাচার্য, শব্দ যন্ত্রী যতীন দত্ত, রসায়নাগার কর্মী শৈলেন ঘোষাল এবং প্রযোজনা তত্ত্বাবধায়ক বিমল ঘোষের সমবেত প্রয়াস। অগ্রদূত এর একদা সহকারী পরিচালক সরোজ দে এবং নিশীথ মুখোপাধ্যায় ও বিমল ভৌমিকের যুক্ত প্রয়াসে অগ্রগামী গোষ্ঠী গঠিত হল। তাঁদের প্রথম ছবি সাগরিকা – দুর্দান্ত হিট ছবি। এই সরোজ দে অনেক পরে একক ভাবে 'কোনি' ছবিটি করেছিলেন আর মাধবী দেবীর একমাত্র জাতীয় শ্রেষ্ঠ অভিনয় উর্বশী পুরস্কার পাওয়া 'দিবারাত্রির কাব্য' ছবির যুগ্ম পরিচালক ছিলেন বিমল ভৌমিক। যাত্রিক গোষ্ঠীর পরিচালকরা হলেন তরুন মজুমদার, দিলীপ মুখোপাধ্যায় আর শচীন অধিকারী। পরে এরা তিনজনই একক প্রয়াসে ছবি করেছেন। তরুন বাবু তো খুবই সফল পরিচালক। যাত্রিক এর প্রথম ছবি 'চাওয়া পাওয়া'।

এই তিন পরিচালক গোষ্ঠীর সাফল্য আসে উত্তম সুচিত্রা জুটির ছবির মাধ্যমে। অগ্রদূত এর অগ্নিপরীক্ষা, অগ্রগামীর সাগরিকা আর শিল্পী আর যাত্রিকের 'চাওয়া পাওয়া'। প্রতিটি ছবিই অতি সুনির্মিত এবং সফল ছবি। অগ্রগামী আর যাত্রিক এর পর আর এই জুটি নিয়ে কাজ করেননি কিন্তু অগ্রদূত করেছেন- সবার উপরে, পথে হল দেরী, সূর্যতোরণ, বিপাশা – প্রতিটিই জনধন্য। এরা সবাই অবশ্য উত্তম কুমারকে নিয়ে অন্য নায়িকার বিপরীতে ছবি করেছেন।

আসা যাক এবার ৫৭ সালে। অসিত সেনের 'জীবন তৃষ্ণা', অগ্রদূত এর 'পথে হল দেরী', নীরেন লাহিড়ির 'পৃথিবী আমারে চায়' আর অজয় করের 'হারানো সুর' – সবকটিতেই উত্তম কুমার এবং একটি বাদ দিয়ে তিনটিতে সুচিত্রা সেন। সব কটি ছবিতেই দারুন সব গান। জীবন তৃষ্ণায় সঙ্গীতকার ভুপেন হাজারিকা। উত্তম কুমারের কন্ঠে একমাত্র এই ছবিতেই ভুপেন বাবু গেয়েছেন। 'সাগর সঙ্গমে সাতার কেটেছি কত'। 'পথে হল দেরী'র সুর রবীন চট্টোপাধ্যায়ের। এ ছবির দুটি গান অনবদ্য। 'তুমি না হয় রহিতে কাছে' আর 'এ শুধু গানের দিন'। হারানো সুরের পরিচালক সেই হেমন্ত বাবু। গীতা দত্তের গাওয়া 'তুমি যে আমার' সর্বকালের সেরা প্রেমের গানের অন্যতম। এ বছরেও দুটি গান রাখতে হয়েছে।

১২) ১৯৫৭ – তুমি যে আমার – গীতা দত্ত - সুর- হেমন্ত মুখোপাধ্যায় "হারানো সুর" (পরিচালক– অজয় কর)

১৩) ১৯৫৭- তুমি না হয় রহিতে কাছে – সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়- সুর-রবীন চট্টোপাধ্যায়- "পথে হল দেরী" (পরিচালক – অগ্রদূত)

একটা কথা বলি, এই যে গোষ্ঠী পরিচালকরা এলেন – এরা বিদেশী ছবির গল্প অবলম্বনে কিছু কিছু ছবিও করলেন। যেমন RANDOM HARVEST অবলম্বনে হারানো সুর আর ROMAN HOLIDAY নিয়ে চাওয়া পাওয়া।

পরের পছর ১৯৫৮ সালেও একই সমস্যা ।বহু সঙ্গীত সমৃদ্ধ ছবি এই বছরেও। আরও একটা বলার মত ঘটনা। এ বছরে বিলায়েত খানের সুরে সত্যজিৎ রায়ের 'জলসাঘর', আলি আকবর খানের সুরে ঋত্বিক ঘটকের অযান্ত্রিক আবার রবিশঙ্করের সুরে তপন বাবুর 'কালামাটি' এবং সত্যজিৎ বাবুর 'পরশপাথর' । ভাবা যায় না, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের তিন মহারথী একই বছরে তিন বিখ্যাত বাঙ্গলা ছবির পরিচালকের ছবিতে কাজ করছেন। তাঁর মধ্যে জলসাঘরে আবার গান গাইছেন বেগম আখতার। তবে সে গান আমরা চয়ন করব না। আমরা আধুনিক গানই রাখব আমাদের ডালিতে। তেমন ছবি আর গানও অনেক। চিত্ত বসু পরিচালিত নচিকেতা ঘোষের সুরে 'বন্ধু', অগ্রগামীর ছবি সুধীন দাসগুপ্তর সুরে রাষ্ট্রপতি পদক প্রাপ্ত ছবি 'ডাক হরকরা', নীরেন লাহিড়ী পরিচালিত নচিকেতা ঘোষের সুরে ইন্দ্রানী। হেমন্ত বাবুর সুরে লুকোচুরি, আর অগ্রদুতের সূর্যতোরন ।
নচিকেতা ঘোষের সুরের কোন গান আসেনি এই নির্বাচনে। তাই এবছরের দুটো গানই থাকবে তাঁর সুরের। মানে 'বন্ধু' আর 'ইন্দ্রানী'। মালা সিংহ বোম্বাই যাওয়ার আগে বেশ কটি বাংলা ছবি করেছিলেন। উত্তম কুমারের সঙ্গেই ৭ টি। কাজেই ওর ছবি হিসাবে 'বন্ধু' থাকুক। তাছাড়া বন্ধু-র 'মৌ বনে আজ মৌ জমেছে' –র মত লিরিক্যাল গান সম্পদ বিশেষ। আরও একটা ব্যাপার আছে। এই ছবিতে সহ নায়ক হয়েছিলেন অসিত বরণ, যিনি উত্তম কুমার আসা পর্যন্ত ছিলেন সবচেয়ে সম্ভাবনা পূর্ণ নায়ক। উত্তম কুমারের আবির্ভাবের পর তিনি যেমন চলচ্চিত্র জগতের দ্বিতীয় সারিতে চলে যান ঠিক তেমনই এই ছবির গল্পেও মালা সিংহের প্রেমিকের আসন থেকে তিনি সরে যান। আর ইন্দ্রানী ছবির তো সব গানই অসাধারন। "নীড় ছোট ক্ষতি নেই' , 'সূর্য ডোবার পালা' , 'ওগো সুন্দর জানো না কি', 'ঝনক ঝনক কনক ব্যাজে' - কোন গানটা যে সেরা তা বলা কঠিন। আমরা কিন্ত বেছে নেব অন্য একটা গান। 'সব কুছ লুটা কর' বলে একটি হিন্দি গান। মহম্মদ রফির গাওয়া। সম্ভবত বাংলা চলচ্চিত্রের রফি সাহেবের এই একটাই গান। এ গান রেকর্ড করতে নচী বাবু বোম্বাই চলে যান। তখন রফি সাহেবের একচেটিয়া বাজার। সামনের বেশ কয়েক মাস কোন দিন খালি নেই রেকর্ড করার। নচিকেতা ঘোষ বলে গিয়েছিলেন একবার যদি শোনাতে পারি, তাহলে রাজি করিয়ে ফেলব। সুর শোনার পর অন্য সুরকারের ভাড়া করা স্টুডিওতেই কথা বলে সময় করে নিলেন মহম্মদ রফি আর রেকর্ড করলেন গানটির। শোনা যায় কোন পারিশ্রমিক নিতে চাননি, নচিকেতা ঘোষ জোর করায় সামান্য পারিশ্রমিক নিয়েছিলেন তিনি। আহা কি গান আর কি গেয়েছেন। এই বছরের নির্বাচনের দুটি গান হল।

১৪) ১৯৫৮ – মৌ বনে আজ – হেমন্ত মুখোপাধ্যায়-সুর- নচিকেতা ঘোষ -" বন্ধু" (পরিচালক– চিত্ত বসু)

১৫) ১৯৫৮- সব কুছ লুটা কর – মহম্মদ রফি- " ইন্দ্রানী" –সুর-নচিকেতা ঘোষ

১৯৫৯ সালের গান নির্বাচনও কঠিন। ছবির নামগুলি বলা যাক। তারপর নাহয় ঠিক করা যাবে। যাত্রিক পরিচালিত 'চাওয়া পাওয়া', অসিত সেন, মৃণাল সেন, আর বিকাশ রায়ের পরিচালনায় 'দ্বীপ জ্বেলে যাই' , 'নীল আকাশের নীচে' , 'মরুতীর্থ হিংলাজ' – তিনটিরই সুর হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের। এছাড়াও আছে গলি থেকে রাজপথ, অবাক পৃথিবী, পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, সোনার হরিণ, বিচারক এর মত ছবি। এই ১৯৫৯ সালেই ঋত্বিক ঘটকের 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' আর সত্যজিৎ রায়ের 'অপুর সংসার' মুক্তি পায়। গলি থেকে রাজপথ ছবিতেই কিন্ত মান্না দে প্রথম উত্তমের লিপে গান করেন, গানটা ছিল 'লাগ লাগ ভেলকির খেলা'। এর পর উত্তমের লিপে মান্না দে গেয়েছেন সাত বছর পর শঙ্খবেলা ছবিতে। গত বছরে যেমন নচিকেতা ঘোষের সুরে দুটো ছবিকে নির্বাচন করা হোল, এবছরে আমরা বেছে নেব হেমন্ত বাবুর সুরের দুটি গান। ২০২২ আর ২০২৩

সালে শতবর্ষ অসিত সেন আর মৃণাল সেনের। এই দুজন পরিচালককে শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁদের ছবির গান থাকুক এই বছরের জন্য। আর গানও তো আছে তেমনই। বারবার শুনলেও ক্লান্তি আসেনা।

১৬) ১৯৫৯ – ও নদীরে একটি কথাই – গায়ক ও সুরকার হেমন্ত মুখোপাধ্যায় - নীল আকাশের নীচে (পরিচালক - মৃণাল সেন)

১৭) ১৯৫৯- এই রাত তোমার আমার – গায়ক ও সুরকার হেমন্ত মুখোপাধ্যায় - দ্বীপ জ্বেলে যাই (পরিচালক – অসিত শ্যেন)

১৯৬০ সালে মুক্তি পায় রাজেন তরফদারের 'গঙ্গা', ঋত্বিকের 'মেঘে ঢাকা তারা', সত্যজিতের 'দেবী', মৃণালের 'বাইশে শ্রাবণ' এবং সঙ্গীত সমৃদ্ধ সুশীল মজুমদারের 'হসপিটাল', চিত্ত বসুর 'মায়ামৃগ', সুধীর মুখোপাধ্যায়ের 'শেষ পর্যন্ত'। 'শেষ পর্যন্ত' ছবিতে বিশ্বজিতের কন্ঠে হেমন্ত গাইলেন 'এই মেঘলা দিনে একলা', 'এই বালুকা বেলায় আমি', 'কেন দূরে থাকো' – এমন সব সুপার ডুপার হিট গান। এমন সব গান থাকা সত্ত্বেও আমাদের নির্বাচনে 'শেষ পর্যন্ত' আসছেনা। হেমন্ত বাবু সেই শাপমোচন থেকে শুরু করে ষাটের দশক পেরিয়েও সত্তরের মাঝামাঝি পর্যন্ত এত চলচ্চিত্র সঙ্গীত উপহার দিয়েছেন যে শুধু তাঁর গান নিয়েই একটা অনুষ্ঠান হয়ে যায়। তাই তাঁর সুরের গান এ বছরে না রেখে আমরা বেছে নেব 'হসপিটাল' আর 'মায়ামৃগ' ছবির গান। ১৯৩৬ সালে চলচ্চিত্র জীবন (জীবন নাইয়া, অচ্ছুত কন্যা) শুরু করে অশোক কুমার তাঁর ২৪ বছর পরে ১৯৬০ সালে একটি বাংলা ছবিতে নায়কের চরিত্রে অভিনয় করলেন বাংলা ছবির সেরা নায়িকার বিপরীতে 'হসপিটাল' ছবিতে। সে ছবিতে যেমন তাঁর অভিনয়, তেমনই সুন্দর সুর অমল মুখোপাধ্যায়ের। আর পরিচালনাও এমন এক জনের যিনি জীবন শুরু করেছেন নির্বাক ছবির পরিচালনা করে ১৯৩২ সালে (একদা ছবিতে) । আমরা অবশ্য পরিচালক সুশীল মজুমদারকে চিনি সত্যজিৎ রায়ের 'চিড়িয়াখানা' ছবির নিশানাথ চরিত্রের জন্য। তাই 'হসপিটাল' ছবির গান থাকছে। আর 'মায়ামৃগ' নির্বাচিত হচ্ছে মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জন্য। এত বড় সঙ্গীত শিল্পী হওয়া সত্ত্বেও মানবেন্দ্র গীত চলচ্চিত্র গানের সংখ্যা সীমিত। এই ছবি ব্যতীত কোন নায়কের গলায় প্রায় নেই। তাঁর সময়েই বেসিক ডিস্কের নামকরা শিল্পী সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, অখিল বন্ধু ঘোষেরও কোন নায়কের গলায় গান নেই। মায়ামৃগ ছবির সুরকারও মানবেন্দ্র বাবুর। আর যে গানটি তিনি এই ছবিতে গেয়েছিলেন সেটি সম্ভবত আর কারুর পক্ষেই এই ভাবে গাওয়া সম্ভব ছিলনা।

১৮) ১৯৬০ – এই সুন্দর স্বর্ণালী সন্ধ্যায় – গীতা দত্ত - সুরকার অমল মুখোপাধ্যায় – "হসপিটাল" (পরিচালক- সুশীল মজুমদার)

১৯) ১৯৬০- মেটেরিয়া মেডিকার কাব্য-গায়ক ও সুরকার মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় – "মায়ামৃগ" (পরিচালক – চিত্ত বসু)

১৯৬১ সালও সঙ্গীত মুখর। ঋত্বিক ঘটকের কোমল গান্ধার, অজয় করের সপ্তপদী ছাড়াও সুকুমার দাস গুপ্তর 'সাথীহারা', সুধীর মুখারজির 'দুই ভাই' মুক্তি পেল। ১৯৬১ সালে মুক্তি প্রাপ্ত অন্যান্য বিশিষ্ট বাংলা ছবি হচ্ছে দেবকী বসুর অর্ঘ্য, সত্যজিৎ রায়ের তিন কন্যা, তপন সিংহর ঝিন্দের বন্দী, বিকাশ রায়ের কেরী সাহেবের মুন্সী, অরবিন্দ মুখারজির আহ্বান। অসাধারন সঙ্গীত চেতনা সত্ত্বেও ঋত্বিকের ছবিতে একমাত্র মার্গ বা লোক সঙ্গীত এবং রবীন্দ্র সঙ্গীতই থাকতো। এক বছর আগে মুক্তি পাওয়া মেঘে ঢাকা তারায় ছিল 'যে রাতে মোর দুয়ার গুলি ভাঙল ঝড়ে' আর এ টি কানন সাহেবের হংসধ্বনি রাগে গাওয়া 'লাগি লাগন পতি সখি সঙ্গ'। কোমল গান্ধারে ছিল দেবব্রত বিশ্বাসের কন্ঠে 'আকাশ ভরা সূর্য তারা' আর সদ্য প্রয়াত সুমিত্রা সেনের কণ্ঠে 'আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে'। শেষোক্ত গানটি বেছে নেওয়া হবে আজকের এই চয়নে। আর সর্বকালের অন্যতম সেরা রোম্যান্টিক গান 'এই পথ যদি না শেষ হয়' এবং এ বছরের তৃতীয় চয়ন - সফল পরিচালক সুকুমার দাসগুপ্তর সঙ্গীত সমৃদ্ধ "সাথীহারা" ছবির গান থাকছে – দুটি গান পরিচালকদের কথা ভেবে আর একটি শুধু গানের জনপ্রিয়তার কারণে।

২০) ১৯৬১ – আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই – সুমিত্রা সেন – সুরকার- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (চলচ্চিত্রের সুরকার জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র)- কোমল গান্ধার – (পরিচালক - ঋত্বিক ঘটক)
২১) ১৯৬১- এই পথ যদি না শেষ হয় – হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় - সুরকার – হেমন্ত মুখোপাধ্যায় – সপ্তপদী – (পরিচালক – অজয় কর)
২২) ১৯৬১ – বাঁশি বুঝি এই সুরে – গীতা দত্ত – সুরকার – হেমন্ত মুখোপাধ্যায়– সাথীহারা (পরিচালনা – সুকুমার দাস গুপ্ত)

১৯৬২ সালে মুক্তি পায় অভিযান, কাঞ্চনজঙ্ঘা, হাঁসুলি বাঁকের উপকথা, অগ্রদূত পরিচালিত বিপাশা, অরূপ গুহ ঠাকুরতার বেনারসী, সুধীর মুখোপাধ্যায়ের রাষ্ট্রপতির পদক প্রাপ্ত 'দাদাঠাকুর', যাত্রিক এর 'কাঁচের স্বর্গ' এবং অজয় করের 'অতল জলের আহ্বান'। এই বছরের কোন গান রাখা হচ্ছেনা এই চয়নে। পরের বছর ১৯৬৩ সালে অগ্রদূতের 'বাদশা', অজয় করের 'বর্ণালী' ও 'সাত পাকে বাঁধা', মানু সেনের 'ভ্রান্তিবিলাস' , পার্থপ্রতিম চৌধুরীর 'ছায়াসূর্য', তপন সিংহর 'নির্জন সৈকতে', সত্যজিৎ রায়ের 'মহানগর' এবং সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় এর 'দেয়া নেয়া' আর যাত্রিকের 'পলাতক' মুক্তি পেল। সঙ্গত কারণেই আমাদের নির্বাচনে দেয়া নেয়া আর পলাতক- দুটি ছবিরই গান থাকবে এ বছরের জন্য। শ্যামল মিত্রর সুরে দেয়া নেয়ার সব গান জনপ্রিয়। আমরা রাখছি আরতি মুখারজির গাওয়া গান 'মাধবী মধুপে'। তাঁর কোন গান এবং শ্যামল মিত্রর সুরের কোন গান এখনও পরিবেশিত হয়নি, তাই এই নির্বাচন। আর বাংলা সিনেমায় যে সব ছবি শুধুমাত্র সঙ্গীতের কারণে মনে রাখতে হয় তাঁর অন্যতম পলাতক। পরিচালক হিসাবে যাত্রিক এর নাম থাকলেও, তরুনবাবুই এই ছবি করেছিলেন। তা তিনি যখন হেমন্ত বাবুকে বললেন সঙ্গীত পরিচালনার জন্য, হেমন্ত বাবু বললেন এ ছবির জন্য যে গান দরকার সেটা তাঁর ঘরানার নয়। তরুন বাবুও ছাড়বেন না। অবশেষে হেমন্ত বাবু রাজি হলেন এবং সৃষ্টি করলেন চিরকালীন কয়েকটি গান। ঝুমুর দলের এমনই একটি যৌথ গান সিনেমায় গেয়েছিলেন রুমা গুহঠাকুরতা আর গীতা দত্ত।
২৩) ১৯৬৩ – মাধবী মধুপে – আরতি মুখোপাধ্যায় – সুরকার - শ্যামল মিত্র- দেয়া নেয়া (পরিচালক – সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়)
২৪) ১৯৬৩- মন যে আমার কেমন কেমন করে – গীতা দত্ত ও রুমা গুহ ঠাকুরতা – সুরকার – হেমন্ত মুখোপাধ্যায় –"পলাতক" (পরিচালনা – যাত্রিক)

১৯৬৪ সালের তেমন কোন সঙ্গীত সমৃদ্ধ ছবি নেই। তবু মুক্তিপ্রাপ্ত উল্লেখ যোগ্য ছবির তালিকাটা দেখে নেওয়া যাক। তপন সিংহর 'আরোহী', সত্যজিৎ রায়ের 'চারুলতা', রাজেন তরফদারের 'জীবন কাহিনি', ও সি গাঙ্গুলির 'কিনু গোয়ালার গলি', মৃণাল সেনের 'প্রতিনিধি'।

১৯৬৫ সালে মুক্তি পায় মৃণাল সেনের 'আকাশ কুসুম', তরুন মজুমদারের 'এক টুকু বাসা' ও 'আলোর পিপাসা', নিত্যানন্দ দত্তর 'বাক্স বদল', সত্যজিৎ রায়ের 'কাপুরুষ ও মহাপুরুষ', বিজয় বসুর 'রাজা রাম মোহন', ঋত্বিক ঘটকের 'সুবর্ণ রেখা' , হীরেন নাগের 'থানা থেকে আসছি' আর গানের কথা ভাবলে অবশ্যই ভাবতে হবে সেই সুনীল বন্দোপাধ্যায় উত্তম শ্যামল মিত্র জুটির 'রাজকন্যা'। এ গানের সুরকার আর গায়ক একই – শ্যামল মিত্র। ।
২৫) ১৯৬৫- এ যেন অজানা এক পথ – সুরকার ও গায়ক শ্যামল মিত্র- রাজকন্যা (পরিচালক- সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়)

পরের বছর ১৯৬৬ সালে 'গল্প হলেও সত্যি', 'নায়ক', পূর্ণেন্দু পত্রীর 'স্বপ্ন নিয়ে' ছাড়াও ধর্মেন্দ্র দিলীপ কুমার অভিনীত জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'পাড়ি', উত্তম কুমার পরিচালিত 'শুধু একটি বছর' , শচীন মুখোপাধ্যায়ের

'কাল তুমি আলেয়া' , পীযুষ বসুর 'সুভাষ চন্দ্র' মুক্তি পায়। সঙ্গীতময় যে সব ছবি এই বছরে মুক্তি পায় তা হল সলিল সেনের 'মণিহার', অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'নতুন জীবন', অগ্রগামীর 'শঙ্খবেলা'। এর মধ্যে সবচেয়ে বাণিজ্য সফল ছবি মণিহার এবং হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরে সে ছবির সব গানই বিপুল জনপ্রিয়। এই চয়নে আমরা অবশ্য বেছে নিয়েছি অন্য দুটি ছবিকে – সাহিত্যিক বনফুলের ভাই অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের চলচ্চিত্র জীবন অতি বর্ণময়। তাঁর পরিচালনার একটি ছবি এবং সুরকার রাজেন সরকারের অন্তত একটি ছবি থাকুক এই গানের ডালিতে সেই ভেবে এই নির্বাচন। আর ষাটের দশকে যে সুরকার এসে বাংলা বেসিক এবং চলচ্চিত্র জগতকে সমৃদ্ধ করলেন সেই সুধীন দাসগুপ্তর সুরে শঙ্খবেলাও থাকবে। এই সেই ছবি যে ছবি থেকে নির্মিত হবে মান্না দে আর উত্তম কুমারের নতুন যাত্রা, যুগল বন্দী, শতাধিক গানের এক সমারোহ।

২৬) ১৯৬৬ – এমন আমি ঘর বেঁধেছি –কন্ঠ- হেমন্ত মুখোপাধ্যায়– সুরকার -রাজেন সরকার – "নতুন জীবন" (পরিচালক- অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়)

২৭) ১৯৬৬- কে প্রথম কাছে এসেছি – মান্নাদে ও লতা মঙ্গেশকর – সুরকার- সুধীন দাস গুপ্ত – শঙ্খ বেলা (পরিচালক – অগ্রগামী)

সলিল চৌধুরী, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, নচিকেতা ঘোষ, রবীন চট্টোপাধ্যায়রা সবাই মিলে পঞ্চাশের দশকে আধুনিক বাংলা গানে বিশেষ করে চলচ্চিত্র সঙ্গীতে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আনেন। ষাটের দশকে সেই পরিবর্তনকারীদের সঙ্গে যুক্ত হয় আরেকটি নাম – সুধীন দাসগুপ্ত।

আসা যাক এবার ১৯৬৭ সালে। সিনেমার কথা বলার আগে মনে করিয়ে দেওয়া দরকার ১৯৬৭ সালে রাজনৈতিক পালা বদলের কথা। যুক্ত ফ্রন্ট সরকার গঠিত হোল পশ্চিমবঙ্গে – এই প্রথম অকংগ্রেসি সরকার। সারা বিশ্ব জুড়েই তখন ছাত্র আন্দোলন। অব্যবহিত পরেই নক্সাল বাড়ি আন্দোলন এবং পাড়ায় পাড়ায় বোমাবাজি, গুলি, হত্যা – এক অস্থিরতার আভাস। তবু নিয়ম করেই হয়েছে সিনেমা থিয়েটার।

এই ১৯৬৭ সালের মুক্তি পাওয়া ছবি – সব নয় বিশেষ উল্লেখের – তার একটু পরিচয় নেওয়া যাক । মঞ্জু দের পরিচালনায় "অভিশপ্ত চম্বল' , সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত আর অনিল বাগচির সুরে 'অ্যান্টনি ফিরিঙ্গী' , তরুন মজুমদারের 'বালিকা বধু', অরুন্ধতী দেবীর 'ছুটি', সত্যজিৎ রায়ের 'চিড়িয়াখানা', সুবোধ মিত্রর 'গৃহদাহ', তপন সিনহার 'হাটে বাজারে' , অগ্রদূতের 'নায়িকা সংবাদ', হীরেন নাগের 'জীবন মৃত্যু, সলিল দত্তর 'প্রস্তর স্বাক্ষর' মুক্তি পায় এই বছরে। খুব যে সঙ্গীতময় বছরটি তা নয়, তবু আমরা এই বছরের দুটি গান বেছেছি। অন্য ধারার ছবির একেবারেই অন্য ধরণের দুটি গান ছিল অরুন্ধতী দেবীর প্রথম চলচ্চিত্র 'ছুটি'তে। গেয়েছিলেন প্রতিমা বন্দোপাধ্যায়। তার একটি – সেই অবিস্মরণীয় গান ' আমার জীবন নদীর ওপারে'। ভূতনাথ দাশের সুরে আর বরদা প্রসন্ন দাস গুপ্তর কথায় এই গানটি ১৯২৯ সালে রেকর্ড করেছিলেন আঙ্গুর বালা দেবী। তার পরে এই প্রতিমা বন্দোপাধ্যায়। আশ্চর্যের কথা, গানটি জনপ্রিয়ও হয়। এমনকি পুজোর প্যান্ডেলেও চলেছে পাশাপাশি পাড়ায়।আমরা অবশ্য এই চয়নে রাখছি 'অ্যান্টনি ফিরিঙ্গী'-র একটি গান আর হীরেন নাগ পরিচালিত 'জীবন মৃত্যু' ছবির একটি দ্বৈত সঙ্গীত - মান্না দে আর সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া 'কোন কথা না বলে' । কি অসাধারণ লিপ দিয়েছেন এই গানে উত্তম কুমার। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকতে হয়। মনে হয় যেন নিজে গাইছেন। এই মধ্য অতিক্রান্ত ষাটের দশকেও সেই উত্তম কুমার দুটি ছবিতেই। সুর অনিল বাগচী আর গোপেন মল্লিকের। দুজনেই উচুদরের সুরকার। অনিল বাগচী তো সেই চল্লিশের দশকে 'কবি' ছবিতেও সুর দিয়েছিলেন। কি অপূর্ব সুর ছিল। এতদিন বাদেও তাঁর কি রেঞ্জ ।

২৮) ১৯৬৭ – আমি যে জলসাঘরে – মান্নাদে - সুরকার- অনিল বাগচি- "অ্যান্টনী ফিরিঙ্গী" (পরিচালক – সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়)

২৯) ১৯৬৭ – কোন কথা না বলে – মান্না দে/ সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় – সুরকার - গোপেন মল্লিক – "জীবন মৃত্যু" (পরিচালক – হীরেন নাগ)

১৯৬৮ সালে নব্যেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের 'অদ্বিতীয়া' , তপন সিংহর 'আপনজন', বিজয় বসুর 'বাঘিনী' , পিনাকী মুখারজির 'চৌরঙ্গী' , অগ্রদূতের 'কখনও মেঘ' মুক্তি পায়। বাংলা চলচ্চিত্রের সেরা বাণিজ্যিক পরিচালকদের অন্যতম বিজয় বসু – সেই বসু। মধু বসু, নীতিন বসু, দেবকী বসু , সত্যেন বসু, চিত্ত বসু – তার পরে এই বিজয় বসু। অভিনেতা হিসাবে চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে যুক্ত হন আভিজাত্য ছবিতে ১৯৪৯ সালে। তারপর অভিনেতা ও সহকারি পরিচালক । স্বাধীন ভাবে পরিচালনা করা "ভগিনী নিবেদিতা" রাষ্ট্রপতির স্বর্ণ পদক পায় ১৯৬২ সালে। তারপর রাজা রামমোহন, আরোগ্য নিকেতন, বাঘিনী, ফরিয়াদ, সাহেব ইত্যাদি ছবি। সমরেশ বসুর কাহিনির "বাঘিনী" এক সুনির্মিত ও বাণিজ্য সফল ছবি। এ ছবিতে সুর দিয়েছেন সেই হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। আদি ও অকৃত্রিম। বহু বাংলা ছবিতে গান গেয়েছেন লতা মঙ্গেশকর। তারই কন্ঠে এই ছবির একটি জনপ্রিয় গান।

৩০) ১৯৬৮ –যদিও রজনী পোহালো তবু – লতা মঙ্গেশকর – সুরকার হেমন্ত মুখোপাধ্যায় –"বাঘিনী" (পরিচালক – বিজয় বসু)

এই গানটি ছাড়াও ও কোকিলা রে, মন নিয়ে আর মরব না কি শেষে, যখন ডাকল বাঁশি , ও রাধে তুই থমকে গেলি কেন – এমন সব শ্রবণপ্রিয় গান ছিল বাঘিনী ছবিতে।

আসা যাক এবার ১৯৬৯ সালে। অপরিচিত, আরোগ্য নিকেতন, চিরদিনের, গুপী গায়েন বাঘা বায়েন, পরিণীতা, মন নিয়ে, পিতা পুত্র, শুকসারী , কমললতা, তিন ভুবনের পারে মুক্তি পায় এই বছরে। সত্যজিৎ রায় অন্য সুরকারদের ওপর নির্ভর না করে নিজেই সঙ্গীত পরিচালনার দ্বায়িত্ব নিয়েছেন বেশ কিছুদিন ধরে। অন্য সব ছবিতে তেমন গান না থাকলেও 'গুগাবাবা' ছবি রীতিমত সংগীতময়। আমরা যেহেতু এই চয়নে পরিচালক, সুরকার, গায়ক , গায়িকা এবং অভিনেতা, অভিনেত্রীদের অধিকাংশের এক প্রতিনিধিত্ব মূলক গ্রন্থনার কথা ভেবেছি সেখানে সত্যজিৎ রায়ের সুরের একটি গান থাকা আবশ্যিক। অতএব শোনা যাক ভৈরবী রাগের সেই অপূর্ব সুন্দর গানটি অনুপ ঘোষালের কন্ঠে।

৩১) ১৯৬৯ – দেখো রে নয়ন মেলে –অনুপ ঘোষাল – সুরকার ও পরিচালক-সত্যজিৎ রায় – গুপী গায়েন বাঘা বায়েন

এ ছাড়াও ১৯৬৯ সালে মুক্তি পাওয়া আরও দুটি ছবির গান থাকছে এই চয়নে। 'কমললতা' ছবিটির চলচ্চিত্রকার হরিসাধন দাসগুপ্ত- ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তথ্য চিত্র নির্মাতা। সত্যজিৎ, চিদানন্দর সঙ্গে একসাথে ফিল্ম সোসাইটি করেছেন। রেনোয়ার 'রিভার' ছবিতে সহকারী পরিচালক। কাহিনিচিত্র করেছেন মাত্র দুটি – একই অঙ্গে এত রূপ আর কমললতা। শরতচন্দ্রের কাহিনি নির্ভর এই সুনির্মিত চলচ্চিত্রে একটি গানে কন্ঠ দিয়েছেন তিন শিল্পী – শ্যামল মিত্র, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় যথাক্রমে নির্মল কুমার ও সুচিত্রা সেনের কন্ঠে এবং পাহাড়ি সান্যাল স্বকন্ঠে। অসাধারণ এই গানটির সুর সেই রবীন চট্টোপাধ্যায়ের। আর আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত 'তিন ভুবনের পারে' এক উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র। মধ্যবিত্ত সমাজের তরুন দের যথাযথ চিত্রায়ন যেমন আছে এই ছবিতে - তেমন আছে সুন্দর কটি গান। সৌমিত্রর লিপে মান্না দের গাওয়া 'জীবনে কি পাবোনা' আজও জনপ্রিয়। তেমনই ভারী সুন্দর একটি প্রেমের গান 'হয়ত তোমারই জন্য' । লক্ষণীয়, মান্না দে ক্রমশ বাংলা ছবির প্রধান গায়ক হয়ে উঠছেন। ১৯৬৬ সালে শঙ্খবেলা ছবিতে উত্তমের কন্ঠে এবং এই ১৯৬৯ সালে সৌমিত্রর কন্ঠে বাজিমাত করলেন তিনি।

৩২) ১৯৬৯ – ও মন কখন যে- শ্যামল মিত্র / সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় / পাহাড়ি সান্যাল –সুরকার- রবীন চট্টোপাধ্যায়- কমললতা – (পরিচালক – হরিসাধন দাস গুপ্ত)

৩৩) ১৯৬৯ – হয়ত তোমারই জন্য – মান্না দে – সুরকার -সুধীন দাস গুপ্ত - তিন ভুবনের পারে (পরিচালক – আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়)

১৯৭০ সালেও দুটি ছবির গান থাকছে এই চয়নে। তার আগে কি কি ছবি মুক্তি পেয়েছিল এই বছরে সেই দিকে চোখ দেওয়া যাক। অগ্রগামীর 'বিলম্বিত লয়', বিমল ভৌমিক ও নারায়ণ চক্রবর্তীর 'দিবারাত্রির কাব্য', মৃণাল সেনের 'ইন্টারভিউ' , সলিল দত্তর 'কলঙ্কিত নায়ক' অরুন্ধতী দেবীর 'মেঘ ও রৌদ্র' , অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'নিশিপদ্ম', ইন্দর সেনের 'প্রথম কদম ফুল', সত্যজিৎ রায়ের 'অরণ্যের দিন রাত্রি' এবং 'প্রতিদ্বন্দ্বী', তপন সিনহার 'সাগিনা মাহাতো' আর সলিল সেনের 'রাজকুমারী'।

আমরা রাখছি রাহুল দেব বর্মণ সুরারোপিত রাজকুমারী ছবির গান। উত্তম কুমারের কন্ঠে এর আগে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, মান্না দে গেয়েছেন। এই ছবিতে গাইলেন কিশোর। যেটা বিশেষ বলবার সেটা হোল উত্তমের অতুলনীয় লিপ মেলানো। মনে হয় তিনিই গাইছেন। এমন গায়ন অভিনয় ক্ষমতা খুব কম অভিনেতারই থাকে। এছাড়া থাকছে নচিকেতা ঘোষের সুরে 'বিলম্বিত লয়' ছবির আরতি মুখোপাধ্যায় গীত একটি ভারী সুন্দর গান।

৩৪) ১৯৭০ – তবু বলে কেন সহসা – কিশোর কুমার – সুরকার -রাহুল দেব বর্মণ – রাজকুমারী (পরিচালক- সলিল সেন)

৩৫) ১৯৭০ - এক বৈশাখে দেখা হল দুজনায় - আরতি মুখোপাধ্যায় – সুরকার- নচিকেতা ঘোষ – বিলম্বিত লয় (পরিচালক- অগ্রগামী)

১৯৭০ সালের অন্তত আরও একটি ছবির গান ভীষণই জনপ্রিয় হয়। নিশিপদ্ম ছবির 'যা খুশী ওরা বলে বলুক' , 'না না আজ রাতে আর যাত্রা শুনতে যাবনা', 'রাজার পঙ্খী' -এর মত গানের কথা বলছি।

১৯৭১ ও ১৯৭২ সালের একটি করে গান রাখা হয়েছে। আগে মুক্তি প্রাপ্ত ছবির কথা। ১৯৭১ সালে অজিত লাহিড়ির 'আটাত্তর দিন পরে', অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'ধন্যি মেয়ে', দিলীপ মুখোপাধ্যায়ের যান্ত্রিক পরিচালিত 'এখানে পিঞ্জর', তপন সিনহার 'এখনই', সুনীল বসু মল্লিকের সাউন্ড অফ মিউজিক অবলম্বনে 'জয়জয়ন্তী', অজয় করের 'মাল্যদান', তরুন মজুমদারের 'নিমন্ত্রণ', অগ্রদুতের 'ছদ্মবেশী' এবং সত্যজিৎ রায়ের 'সীমাবদ্ধ' মুক্তি পায়। যদিও জয়জয়ন্তী বা ধন্যি মেয়ের গান ভীষণই জনপ্রিয় হয়, আমরা বেছে নিয়েছি ছদ্মবেশীর একটি গান। আশা ভোঁসলে এমনিতেই বাংলা বেসিক ও চলচ্চিত্রের বহু গানের গায়িকা। এই চয়নে তার অন্তত একটি গান থাকা উচিত ভেবেই ' আরো দূরে চল যাই' গানটি রাখা হয়েছে। তার আগে বলি উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা গল্প নিয়ে ছদ্মবেশীর প্রথম চলচ্চিত্রায়ন হয় ১৯৪৪ সালে। সে ছবির নায়ক নায়িকা ছিলেন জহর গাঙ্গুলি আর পদ্মা দেবী। সঙ্গীত দিয়েছিলেন শচীন দেব বর্মণ। আর ১৯৭১ সালের ছদ্মবেশী ছবিতে সুর দিলেন সুধীন দাস গুপ্ত। তার সুরে আশা ভোঁসলে , আরতি মুখোপাধ্যায়, বনশ্রী সেন গুপ্ত বহু জনপ্রিয় গান উপহার দিয়েছেন। যেমন সুর তেমন গায়কী। একটা কথা বলা দরকার যে ১৯৪৪ সালের একটি গান হুবহু রেখে দেওয়া হয়েছিল ১৯৭১ সালের এই ছবিতেও। সুধীন দাসগুপ্ত এই ভাবেই শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন তখনও জীবিত শচীন দেব বর্মণকে। গান টি ছিল "আরে ছো ছো কেয়া সরম কী বাত"। ১৯৪৪ সালে রনজিত রায়ের লিপে এবং ১৯৭১ সালে জহর রায়ের লিপে অনুপ ঘোষালের কন্ঠে গানটি গীত হয়।

৩৬) ১৯৭১ – আরো দূরে চল যাই – আশা ভোঁসলে – সুরকার- সুধীন দাস গুপ্ত –ছদ্মবেশী (পরিচালনা- অগ্রদূত)

বাহাত্তর সালের উল্লেখ যোগ্য ছবি হচ্ছে হীরেন নাগের 'বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা', মৃণাল সেনের 'কলকাতা ৭১', পিনাকী মুখোপাধ্যায়ের 'মেমসাহেব', ইন্দর সেনের 'পিকনিক' আর সলিল দত্তর 'স্ত্রী'। স্পস্টতই উল্লেখ করার মত ছবির সংখ্যা কমে আসছে প্রতি বছরেই। এর মধ্যে স্ত্রী ছবির গান নিঃসন্দেহে মনে রাখার মত, বিশেষ করে প্রধান চরিত্র উত্তম কুমারের কন্ঠে মান্না দে এবং দ্বিতীয় পুরুষ চরিত্র সৌমিত্রর কন্ঠে হেমন্ত মুখোপাধায়ের কন্ঠে দ্বৈত সঙ্গীত "হাজার টাকার ঝাড় বাতিটা' । কি অদ্ভুত ব্যাপার। যে হেমন্ত ছিলেন উত্তমের প্রেমের গানে অনিবার্য নির্বাচন, সেই তিনি উত্তম আছেন এমন ছবিতে গাইছেন তার প্রতিপুরুষের কন্ঠে, এবং সেই দৃশ্যেই উত্তম গাইছেন অন্যের কন্ঠে। বলা বাহুল্য, নচিকেতা ঘোষের সুরে স্ত্রী ছবির প্রতিটি গানই জনপ্রিয়।

৩৭) ১৯৭২ – হাজার টাকার ঝাড়বাতিটা – মান্না দে/ হেমন্ত মুখোপাধ্যায় – সুরকার- নচিকেতা ঘোষ - স্ত্রী (পরিচালনা – সলিল দত্ত)

১৯৭৩ সালে উত্তম অভিনীত ছটি ছবি মুক্তি পায় – রাতের রজনীগন্ধা, সোনার খাঁচা, বনপলাশীর পদাবলী, নকল সোনা, কায়াহীনের কাহিনী, রৌদ্রছায়া। তার মধ্যে সোনার খাঁচা আর বনপলাশীর পদাবলী বাদ দিয়ে একটি ছবিতেও উত্তমের অভিনয় নজর কাড়ার মত নয়।

আর সৌমিত্রর ছবি আটটি। অপর্ণা সেনের বিপরীতে চারটি ছবি – বসন্ত বিলাপ, এপার ওপার, শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন, বিলেত ফেরত। তাছাড়া নতুন দিনের আলো, নিশিকন্যা, অগ্নিভ্রমর এবং অশনি সংকেত। এর বাইরে উল্লেখযোগ্য ছবি হচ্ছে দীনেন গুপ্তর 'মরজিনা আব্দাল্লা', মৃণাল সেনের 'পদাতিক', তরুন মজুমদারের 'শ্রীমান পৃথ্বীরাজ' এবং পূর্ণেন্দু পত্রীর 'স্ত্রীর পত্র"। যদিও বসন্ত বিলাপ আর মরজিনা আবদাল্লা ছবি দুটি এবং তাঁর গানও জনপ্রিয় হয়, ১৯৭৩ সালের কোন ছবির গানই আমরা রাখছিনা এই বিশেষ চয়নে।

ভাল লাগার ছবি, ভাল লাগা ছবির গান সত্তরের দশক থেকেই সঙ্কুচিত হচ্ছে। বিশেষ করে রোমান্টিক গান। ১৯৭৪ সালে মুক্তি পায় উত্তম আছেন এমন ৭টি ছবি – অমানুষ, যদুবংশ, বিকেলে ভোরের ফুল, রোদন ভরা বসন্ত, রক্ত তিলক, আলোর ঠিকানা, যদি জানতেম। সৌমিত্রর চারটি ছবি – যদি জানতেম, সোনার কেল্লা, অসতী, সঙ্গিনী। অন্যান্য উল্লেখ করার মত ছবি হচ্ছে পূর্ণেন্দু পত্রীর 'ছেড়া তমসুক' এবং তরুন মজুমদারের "ফুলেশ্বরী"। শমিত ভঞ্জর কন্ঠে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এই শেষ বেলাতেও সুর ও কণ্ঠ দিলেন কিছু সুন্দর গানের। এই ছবির গান লিখেছিলেন পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, মুকুল দত্ত সহ আরো দুজন। তথাপি কি সুর আর কি গায়কী – কিন্তু সেই স্বর্ণ যুগের হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এখানে অনুপস্থিত। তাই কোন গানই রাখা হল না ফুলেশ্বরীর বা ১৯৭৪ সালের কোন ছবির।

১৯৭৫ সালেরও কোন গান রাখা যাচ্ছে না। এই বছরে উত্তমের অভিনয়ে ৮ টি ছবি মুক্তি পায়। আমি সে ও সখা, অগ্নীশ্বর, নগর দর্পণে, কাজল লতা, প্রিয় বান্ধবী, সন্ন্যাসী রাজা, বাঘবন্দী খেলা এবং মৌচাক। প্রায় সব কটিই বয়স্ক পুরুষের চরিত্রে। সৌমিত্রর ছবি তিনটি- ছুটির ফাঁদে, নিশি মৃগয়া, সংসার সীমান্তে। ১৯৭৬ সালে তেমনি উত্তমের ৭ টি ছবির একটিও মনে রাখার মত নয় – হোটেল স্নো ফক্স, আনন্দ মেলা, মোমবাতি, সেই চোখ, নিধিরাম সর্দার, বহ্নিশিখা, চাঁদের কাছাকাছি। সৌমিত্রর তিনটি ছবির মধ্যে একমাত্র উল্লেখ করার অজয় কর পরিচালিত সুচিত্রার বিপরীতে 'দত্তা'। বাকি দুটি ছবি নন্দিতা , সুদুর নীহারিকা এক অনুল্লেখ্য প্রয়াস মাত্র।

১৯৭৭ সালে উত্তম অভিনীত রাজবংশ, সব্যসাচী, অসাধারণ, ভোলা ময়রা, সিস্টার, জাল সন্ন্যাসী, আনন্দ আশ্রম – মোট ৭ টি আর সৌমিত্রর তিনটি – বাবুমশাই, মন্ত্র মুগ্ধ, প্রতিমা।। তালিকাই প্রমাণ করে ক্রমশ দুই প্রধান শিল্পী বা নায়কের অভিনয় ক্ষমতা, ছবির মান সবই নিম্নগামী হচ্ছে। বস্তুত উত্তম সৌমিত্রর অধিকাংশ ছবিই এই কবছরে অতি সাধারণ। অবশ্যই নামী পরিচালকদের ছবি এই মূল্যায়নে ধরা হচ্ছেনা। এই সময়কালে

নতুন নায়ক হিসাবে আত্ম প্রকাশ করেছিলেন স্বরূপ দত্ত এবং শমিত ভঞ্জ ১৯৬৮ সালে 'আপনজন' ছবিতে। দীপঙ্কর দের প্রথম ছবি সীমাবদ্ধ আর রঞ্জিত মল্লিকের ইন্টারভিউ ছবিও একই বছরে ১৯৭১ সালে। এরা নবাগত – সেই সুবাদে কম বয়সি চরিত্রে রোমান্টিক চরিত্রে তারা সুযোগ পাচ্ছেন, কিন্ত তাঁদের দুর্ভাগ্য, পঞ্চাশের দশকের সেই সব সুরকারদের সাহায্য পাননি তারা।

বাংলা ছবির এবং তাঁর গানের স্বর্ণযুগ অস্তাচলে যেতে থাকে সত্তরের প্রথম থেকেই। দুই প্রধান তারকার চেহারায় বয়সের ছাপ পড়ছে, রোমান্টিক দৃশ্যে তারা বেমানান হচ্ছেন। পঞ্চাশের গানের স্রষ্টারাও বুড়ো হচ্ছেন। তেমন গানই আর হচ্ছেনা।

এই চয়ন ইতি করা হবে এক অন্য ধরণের গানের কথা বলে। ১৯৭৬ সালে তপন সিনহার 'হারমোনিয়াম' চলচ্চিত্রে স্বকন্ঠে গান গেয়েছিলেন ছায়া দেবী – যিনি যৌবনে ঠিক পাহাড়ি সান্যালের মতই ছিলেন সেই সময়ের নিয়ম মোতাবেক নায়িকা গায়িকা। যেখান থেকে আমরা শুরু করেছিলাম সেই শুরুর জায়গায় যেন ফিরে যাওয়া এই গানের মাধ্যমে।
আরও একটা ব্যাপার আছে। তপন সিংহ বহুদিন থেকেই তাঁর ছবিতে সুর দিয়েছেন। কিছু সুন্দর গানও আছে। আমরা অনেকেই কিন্ত ভুলে যাই তাঁর এই বৈশিস্টের কথা। সুরকার ও পরিচালক বললে শুধুমাত্র সত্যজিৎ রায়ের কথাই আমাদের মনে আসে।

৩৮) ১৯৭৬ – আহা ছল করে – ছায়া দেবী এবং অন্যান্য – সুরকার ও পরিচালক – তপন সিংহ-হারমোনিয়াম

৩৮ টি গানের ডালি সম্বলিত বাংলা চলচ্চিত্র সঙ্গীতের কিছু গান, কথা ও প্রাসঙ্গিকতা উপস্থাপন এখানেই শেষ হল। মনে রাখতে হবে আর চার বছর বাদেই প্রয়াত হবেন বাংলা সিনেমার সবচেয়ে উজ্জ্বল নায়ক অভিনেতা উত্তম কুমার । সত্তরের প্রথম থেকেই যে সঙ্কট দেখা যাচ্ছিল বাংলা ছবিতে তাই ঘনীভুত হবে আগামী দিনে। আমরা কিন্ত মনে রেখে দেব সেই সব গান যা ষাট সত্তর বছর পরেও আজ জনপ্রিয়।

এই নির্বাচনের মাধ্যমে কালানুক্রমিক ভাবে বাংলা সিনেমার গানের প্রতিনিধিত্বমূলক পরিচয় রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। আমাদের নির্বাচিত গানগুলির বাইরেও বহু শ্রুতিমধুর গান রয়ে গেছে। অনেকের মনে হতেই পারে অমুক বছরের জন্য অমুক সিনেমার গান রাখা যেতে পারত – হতেই পারে। যেহেতু আমরা এই চয়নে চেয়েছি পরিচালক, সুরকার, সঙ্গীত শিল্পীদের যতটা সম্ভব স্মরণ করতে, তাই আমাদের চয়নের কারণ কখনও সুরকার, কখনও পরিচালক, কখনও সঙ্গীত শিল্প, এমনকি কখনও অভিনেতা এবং অভিনেত্রী। এভাবেই যে সব পরিচালকদের সিনেমার গান এই তালিকায় আছে তারা হলেন দেবকী বসু, নীতিন বসু, প্রমথেশ বড়ুয়া, বিমল রায়, নীরেন লাহিড়ী, সুধীর মুখোপাধ্যায়, সুশীল মজুমদার, সুকুমার দাসগুপ্ত, শম্ভু মিত্র, অমিত মৈত্র, অগ্রদূত, অগ্রগামী, যাত্রিক, অজয় কর, চিত্ত বসু, সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটক, তপন সিংহ, অসিত সেন, অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়, সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, হীরেন নাগ, বিজয় বসু, হরিসাধন দাসগুপ্ত, আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, সলিল সেন, সলিল দত্ত। এঁদের কারোর কারোর একাধিক ছবিও স্থান পেয়েছে। যে সব উল্লেখযোগ্য পরিচালকের গান রইল না এই চয়নে, তারা হলেন ফণী মজুমদার (সাথী, ডাক্তার), মধু বসু (আলিবাবা), সত্যেন বসু (পরিবর্তন, বরযাত্রী), সুবোধ মিত্র (রাইকমল), নির্মল দে (সাড়ে চুয়াত্তর), বিকাশ রায় (মরুতীর্থ হিংলাজ), মানু সেন (ভ্রান্তিবিলাস), ইন্দর সেন (প্রথম কদম ফুল), অরুন্ধতী দেবী (ছুটি), অজিত গাঙ্গুলী (হংসরাজ), কমল মজুমদার (লুকোচুরি), পিনাকী মুখোপাধ্যায় (ঢুলী), পীযুষ বসু (শুকসারী), দীনেন গুপ্ত (বসন্ত বিলাপ, মরজিনা আবদাল্লা)।

যে সব সুরকারদের গান চয়ন করা হয়েছে তারা হলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, রাইচাদ বড়াল, কমল দাসগুপ্ত, পঙ্কজ মল্লিক, অনিল বাগচী, সলিল চৌধুরী, অনুপম ঘটক, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, রবীন চট্টোপাধ্যায়, অমল মুখোপাধ্যায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, নচিকেতা ঘোষ, সুধীন দাসগুপ্ত, শ্যামল মিত্র, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, গোপেন মল্লিক, রাহুল দেব বর্মণ, রাজেন সরকার, সত্যজিৎ রায় এবং তপন সিংহ। এভাবেই যেসব গায়ক গায়িকাদের আমরা শ্রদ্ধা জানালাম তাঁরা হলেন কৃষ্ণচন্দ্র দে, কে, এল সায়গল, রবীন মজুমদার, ছায়া দেবী, পাহাড়ি সান্যাল, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, মহম্মদ রফি, লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কিশোর কুমার, সুমিত্রা সেন, রেখা মল্লিক, রুমা গুহঠাকুরতা, কানন দেবী, আরতি মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, মান্না দে, গীতা দত্ত এবং হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। উল্লেখযোগ্য সুরকার এবং গায়কদের মধ্যে কালিপদ সেন, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় ও ইলা বসুর কোনও গান নেই এই চয়নে।

যেসব অভিনেতা অভিনেত্রীর অভিনয় সমৃদ্ধ ছবি উল্লেখ করা হল তাঁদের মধ্যে যেমন আছেন পাহাড়ী সান্যাল, ছায়া দেবী, রবীন মজুমদার, কানন দেবী, কে এল সায়গল, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, তেমনই আছেন রাজ কাপুর, নার্গিস, মালা সিংহ, অশোক কুমার, মঞ্জু দে, অনিল চট্টোপাধ্যায়, বসন্ত চৌধুরী, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত বরণ, তপেন চট্টোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, শমিত ভঞ্জ, নির্মল কুমার, মাধবী মুখোপাধ্যায়, সুপ্রিয়া দেবী, সন্ধ্যা রায়, রুমা গুহ ঠাকুরতা, তনুজা, বিশ্বজিৎ, অনুপ কুমার, রীনা ঘোষ, আরতি ভট্টাচার্য, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় এবং উত্তম কুমার সুচিত্রা সেন জুটির আট টি ছবি সহ উত্তম কুমার এবং সুচিত্রা সেনের আরও কয়েকটি ছবি।

পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে মধ্যসত্তরের যুগ – প্রায় দুই দশকের এই সময়কালে এমন কিছু সিনেমার গান সৃষ্টি হয়েছে যা আজও মানুষকে মোহিত করে রাখে। এই চয়নের মাধ্যমে বাংলা সিনেমার সঙ্গে জড়িত পরিচালক, সুরকার, শিল্পী, অভিনেতা অভিনেত্রীদের এবং কলা কুশলীদের শ্রদ্ধা জানান হল।

Anjan Das Mazumdar is a veteran film society activist working to spread film culture for more than four decades.